মনে পড়ে রুবী রায়!

দিলরুবা শাহানা

উইনরক স্কলারশীপদাতাদের বিচিত্র ধারার চিঠিটা ইরাকে ভাবনায় ফেললো। স্কলারশীপের জন্য মোটেও সে মরিয়া নয়। শাশুড়ীর উৎসাহে চার পাঁচ শ' শব্দের রচনাটা লিখে ফেলেছিল। উঁনিই তাঁর দারোয়ান বা আর্দালী দিয়ে পোস্টও করিয়েছিলেন। তারপরে যখন দেখা গেল সমস্ত পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের পাঁচজন মাত্র নির্বচিত হয়েছে এবং তাদের মাঝে মেয়ে একমাত্র ইরা। শাশুড়ীর আনন্দ আর ধরেনা। তাঁর ছেলে যে একটি রত্নকে বিয়ে করেছে তা উনি আগেই বুঝেছিলেন। পরীক্ষাতে হয়তো ষ্টারমার্ক বা লেটারমার্ক পায়নি কখনো তবে ইরার প্রধানশিক্ষিকা শাশুড়ী ওকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এম.এ পাশ করিয়েছেন। মেধার অপচয় যাতে না হয় তাই এক গবেষণা প্রতিষ্ঠাণে চাকরী করতেও উৎসাহ জুগিয়েছেন। একমাত্র ছেলের বউকে শাশুড়ী আদর ও শাসনে স্থিতধী রাখতে দারুন সফল। শিক্ষকের দৃষ্টিতে ইরার শক্তি ও সম্ভাবনা এড়ায়নি।

ইরা বুদ্ধিমতী তবে খেয়ালী বড়। খেয়ালী মনের তাগিদে 'আরও কতদিন বাকী তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায় নিভে যায় মোর আঁখি' এই উদাস করা গান শুনে এম এ পরীক্ষায় বসলোনা। উদাসীর পাশে সানন্দে কনে সেজে বিয়ের আসনে বসলো। বিয়ের সময় ইরার বাবা বলেছিলেন

'আমার সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েটিই অন্য সন্তানদের মতো পরীক্ষাতে দারুন কিছু করেনি কখনো, আপনার গুণী ছেলে ওর গুণ খুঁজে পাবে আশাকরি'

শাশুড়ীই গুণ বুঝেছিলেন আগে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে সবাই যখন দৌড়াচ্ছে সবকিছু পাওয়ার উদগ্র বাসনার পিছনে। আর ইরা? ওকে দেখলে মনে হয় ও আছে সব পেয়েছির ভূবনে।

বন্ধুরা সবাই নানা জায়গায় অমুক তমুক হয়ে বসেছে। কমনওয়েলথ আর ফুলব্রাইট স্কলারশীপে নন্দিত হচ্ছে। ইরার কোনই তাগাদা নেই।

উইনরকের নয়মাসের অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস ফেলোশিপ এটা। অর্থমূল্যও অনেক। সমস্ত পৃথিবী ছেকে মাত্র পাঁচজনকে বেছে নিয়েছে। যখন সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন আবার এই চিঠি কেন? সারমর্ম হল রিজিওনাল চিফ ইরফান জুবের ঘটনাক্রমে এখন এখানে। এই ভদ্রলোক সরাসরি স্কলারশীপ হোল্ডারকে দেখতে চান। এই নাম কখনো শুনেছে বলে মনে পড়লোনা ইরার।

যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে রিসেপশনে বসতেই অল্প অপেক্ষার পরই ওকে এক দরজার পাল্লা খুলে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলো রিসেপশনিষ্ট।

সুন্দর টেবিলের ওপাশে জমকালো চেয়ারে কাঁচাপাকা ঘন চুলের লম্বা মুখাকৃতির আকর্ষণীয় উজ্জল চেহারার দীর্ঘদেহী পাতলা গড়ণের এক ভদ্রলোক কিছু যেন লিখছেন। মুখ না তুলেই টেবিলে তবলায় বোল তোলার ভঙ্গিতে মৃদু আঙ্গুল টুকে বললেন

'Take a sit'

বসার পর পরই ভদ্রলোক মুখ তুলে ভালকরে ইরাকে দেখলেন। ইরা ভাবছিল কি ভাষাতে না জানি ইনি কথা বলবেন। ভদ্রলোক কৌতুকের হাসি চোখে নিয়ে যা বললেন তাতে ইরার পায়ের নীচে ভূ-গোলক দুলে উঠলো আর মনে হল কবে কোনকালে কৃত অপকর্মের জন্য আজ ওর স্কলারশীপ বুঝি ভন্ডুল হতে চললো।
চোখে রহস্যের হাসি আর ঠোঁটে উচ্চারিত হল অবিস্মরনীয় জিজ্ঞাসা
'মনে পড়ে রুবী রায়?'
ফর্সা গোলগাল, মাঝারি আকৃতি, উগ্র নয় তবে বর্ননাতীত নম্র সৌন্দর্যের প্লাবনে স্নাত পরিপূর্ণ তরুণী ইরার ভীতশংকিত সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ইরফান জুবেরের মনে হল একে দেখে অনেকে নিশ্চয় গেয়েছে
'বিধি ডাগড় আঁখি যদি দিয়েছিল সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবেনা'।
তার মনে হল মেয়েটির চেহারায় বুদ্ধির ছাপ আছে অবশ্যই। তবে ভাবেভঙ্গিতে, পারিপাট্যে তা ফুটিয়ে তোলার চৌকস প্রয়াসের অভাব লক্ষণীয়। ইরফান কোথায় যেন পড়েছেন খুব সুন্দরী মেয়েরা হয় মাথায় গবেট নয় স্বভাবে তরল, আবার তাদের মাঝে কেউ মনে অর্থহীন গরিমার গরল নিয়ে চলে। তবে এই মেয়েটি গবেট নয়। ইরফানের ভাগ্য ভাল সুন্দরী গবেট কেউ তাকে ভোলাতে পারেনি কখনো।
ইরফান জুবের উচ্চারিত 'মনে পড়ে...' গানের কলি মূহুর্তে ইরার সামনে কোন দূর অতীতের স্মৃতির জানলা খুলে দিল।

পিচঢালা সড়কের পাশে দাড়ানো হালকা হলুদ রঙের স্কুলবিল্ডিং থেকে নানা বয়সের মেয়েরা বেরয়। কেউ ডানদিকে, কেউ বায়ে, কেউবা দলবেঁধে পিচের সড়ক পেরিয়েই উল্টোদিকের ইটবিছানো পথে হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফেরে। তখন মানুষের অফুরান ঢেউ যেমন ছিলনা, গাড়ী-ট্রাকের স্রোতের গর্জনও তেমন হতোনা।
ইটের পথের ডানদিকেই ছিল বইয়ের দোকান। বই ছাড়াও কাগজ-কলম, পেন্সিল-রাবার পাওয়া যেতো। স্কুলছাত্রীরাও দরকার মত টুকটাক জিনিস কিনে নিতে পারতো। বড়মেয়েরা নিজেরা দোকানে না গিয়ে নীচের ক্লাসের কাউকে বলতো
'যাতো ভাই, আমার জন্য একদিস্তা কাগজ নিয়ে আয় আমরা দাড়াচ্ছি এখানে'
কখনো কেউ বলতো 'কলমটা এনে দেনা ভাই'।
ছোটরা দায়িত্ব পেয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়ার গৌরবে ভর করে প্রজাপতির মত ছুটে যেতো।

এমনি এক রোদ চকচকে বিকালে স্কুল থেকে ফেরার পথে নাইনে বা টেনে পড়ুয়া দীর্ঘাঙ্গী, লম্বাচুল, খাড়ানাক, খয়েরী চোখের রচিআপা ফাইভের ইরার হাতে পয়সা দিয়ে বলেছিল

‘এই আমার জন্য রাবার কিন্‌বি একটা আর ঐ যে তিনটা ছেলে দাড়িয়ে দোকানে তাদের মাঝে লম্বাটে, ফর্সা, লালচে চুলের যে তাকে একটা ভেংচি কেটে দৌড়ে চলে আসবি, ঠিক আছে’
সঙ্গের একজন বললো
‘ভেংচি কেন কাটবে?’
‘শুনিস্‌নি ঐ ক্যাডেটপড়ুয়ারা পরীক্ষা শেষে এখানে পাড়ার দোকানে বসে গান গায় ‘মনে রুবী রায়...’
কথাটা শুনেই ছেলেটিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পড়িমরি করে ছুটেছিল ইরা। চোখ ট্যারা বানিয়ে, জিব বের করে ভেংচি কেটে শাঁ শাঁ করে ফিরে এসেছিল ও।
শুনলো একজন বলছে
‘তুই মনে হয় ঐ গান শুনার জন্য কান পেতে রাখিস রচি’
‘কি বলিস না বলিস তোরা!’
‘শোন্‌ ইরা তুই যে ভেংচি কাটলি তোর নামে বিচার দেবে বাসাতে, একলা পেলে তোর কান মলে দেবে দেখিস।’
ভয় পেয়ে কান ব্যথার মিথ্যা দোহাই দিয়ে ইরা এক সপ্তাহ স্কুলে যায়নি। ঐ ছেলেদেরও আর দেখেনি পরে। তবে ইরার সে দুঃসাহসী দুষ্টামীর গল্প স্কুলের সবাই জেনে ফেলেছিল। বড়মেয়েরা জিজ্ঞেস করতো
‘কোন গানটা গেয়েছিলরে ছেলেটা?’
ছোটরা সাহসিনীকে বলতো
‘কি রকম ভেংচি দিয়েছিলি দেখাতো।’

ইরা পরে ‘মনে পড়ে রুবী রায়’ গানটা যতোবার শুনেছে নিজের ওইটুকু বয়সে করা দুঃসাহসী দুষ্টামীর জন্য হেসেছে। এমনকি হিন্দীতেও এই সুরের গানটি শুনে সেই স্মৃতি মনে পড়েছে।

ভদ্রলোকের মুখটি পলকে দেখে বিষন্ন না প্রসন্ন তা যাচাই করতে পারলোনা। ইরা নিজেই বিষন্ন আর বিপন্ন। ঐদিন ভেংচি কেটে ওদের বইয়ের দোকান থেকে তাড়িয়ে না দিলে কত মনোরম মনোহর কিছু ঘটতে পারতো। মূহুর্তে অভিনব এক চিত্রকল্প ওর মনে ভেসে উঠলো। রচি আপা একদিন ইরফান জুবেরের সাথে ইটের সড়ক ছেড়ে ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলতে শুরু করলেন। মায়াবী ছায়াবীথির শেষে উথালপাতাল ঢেউ নিয়ে জীবনের সমুদ্র সফেন সামনে হাজির হল। ঐ সমুদ্র পাড়ি দিতে দু’জনে একই নৌকায় চড়ে বসলেন। তারপরে দু’জনে ঢেউ ছাপিয়ে গলা ছেড়ে গাইলেন
‘পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি’।
কিন্তু হায় সেসব কিছুই ঘটেনি। তার উপর কালের স্রোতে ইরার পুরাতন অপরাধ তামাদী হয়নি। সেই অপরাধের শাস্তি হিসাবে ওর স্কলারশীপ আজ বাতিল

হতে চলেছে বোধহয়। একটা ব্যাপারেই খট্‌কা লাগছে তা হল ওর নাম উনি জানলেন কিভাবে? এইসব চিন্তায় মূহুর্ত ব্যয় হয়নি। ভদ্রলোকের গলার স্বরে চমকে গেলেও আনন্দের স্রোত ছুট্‌লো রক্তে

'কনগ্রাচ্যুলেশন স্কলারশীপের জন্য আর গোপন খবর হল তোমার রচিআপা আমার সঙ্গেই আছেন, উনি আনন্দেই আছেন।'